Vol. 45 | No. 3 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাব্যচর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ

Volume	45
Issue	3
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ শামছুল আলম, মুহাম্মদ আল আমীন
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i3.5
Pages	১০২-১২৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাব্যচর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোঃ শামছুল আলম *

মুহাম্মদ আল আমীন **

কবিতা সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান শাখা। প্রাচীনকালে কবিতার মাধ্যমে মানুষেরা বিভিন্ন সমাজের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেত। আরব সমাজে এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। মহানবীর (স) আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরবী কাব্যসাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তখনকার আরবের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, গোত্রীয়, জাতীয় তথা সমাজ জীবনের সকল দিকই তাদের কবিতার মধ্যে চিত্রিত হত। এ কারণেই রাঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেছেন– الشعر ديوان العرب (Poetry is the public register of the Arab)[১] তখন আরবরা কেবল কাব্যচর্চায় ক্ষান্ত ছিল না। তারা কাব্যচর্চার আসর বসিয়ে প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে হার মানাতে চেষ্টা করত। আরবদের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাব্য প্রতিভার কথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে কবিতা তাদের গর্বের বস্তু এবং মর্যাদার মাফকাঠিতে পরিণত হয়। এহেন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)-কে মুজিযা স্বরূপ আল-কুরআন দান করেন। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তাদের গর্বের মূলে কুঠারাঘাত হানে। কুরআনের ভাব ও ভাষা-মাধুর্য আরবের কবি গোষ্ঠীকে থমকে দেয়। প্রথম পর্যায়ে তারা কুরআনের বাণীকে কবিতা এবং মহানবী (স)–কে কবি বলে আখ্যায়িত করে। এ পবিত্র কুরআনে সে কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন "তারা বলে, (এগুলো মুহাম্মদ (স)-এর অলীক স্বপ্ন, বরং সে এটা নিজে রচনা করেছে এবং সে একজন কবি।"[২] "তারা বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?"[৩] তাদের এ ধরনের অবান্তর দাবির তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লাহ তাআলা কয়েকটি আয়াত নাযিল করেছেন এবং তাতে কুরআন মানব রচিত গ্রন্থ হলে তার সমকক্ষ রচনা করে দেখানোর জন্য

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** এম. ফিল. গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলেন "এটা (কুরআন) নয় কোন কবির কথা, তোমরা খুব কমই বিশ্বাস কর। নয় এটা কোন গণকের কথা, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।"[৪]

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তাহলে তোমরা এর মত একটি সূরা নিয়ে এস। ডেকে নাও তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে এক আল্লাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৫] "যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কোন বাণী রচনা করে উপস্থিত করুক।"[৬] "অথবা তারা কি বলে, এ কুরআন সে নিজে রচনা করেছে? বলে দিন, তবে তোমরা অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া, যাকে পার, ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৭] কুরআনের ভাষা মাধুর্যের নিকট তাদের পরাজয় নিশ্চিত। আল্লাহ ঘোষণা করেন– "যদি তোমরা তা করতে না পার, আর কখনও তোমরা করতে পারবে না।"[৮] "আপনি বলে দিন, যদি সকল মানুষ ও জিন এ উদ্দেশে সমবেত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করবে তারা পারবে না, যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়।"[৯] আল্লাহর চ্যালেঞ্জ সত্যে পরিণত হয়। তারা অনেক চেষ্টা-সাধনা করে কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার ন্যায় কোন সূরা রচনা করতে অক্ষম হয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করে নেয় "এটা কোন মানুষের কথা নয়।" কুরআনের আয়াত একের পর এক নাযিল হতে থাকে, আর আরবদের কাব্যপ্রীতি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পবিত্র কুরআন সর্বোন্নত সাহিত্যের শাশ্বত ভাণ্ডার হিসেবে সকলের নিকট প্রিয় থেকে প্রিয়তর হতে থাকে। মুসলমানরা কুরআনকে অমৃত সুধার ন্যায় নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন। কাব্যচর্চা থেকে তাঁরা অনেকটা দূরে থেকে কুরআনের অমিয় বাণী তিলাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেন। তথাপি মহানবীর (স) নির্দেশে কতিপয় সাহাবী কাফির-মুশরিকদের কাব্যের যথার্থ জবাব দেয়ার জন্য কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। সাহাবীদের (রা) পরেও মুসলমানরা কম-বেশি কাব্যচর্চার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। সুপ্রসন্ন করেছেন বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে নিজেদের আসন।

কবিতার সংজ্ঞা

কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে সাহাবা কিরাম (রা) থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগের প্রতিটি ভাষার কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ কম-বেশি আলোচনা করেছেন। মহানবী (স) একদা আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে উদ্দেশ করে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! কবিতা কি, আমাকে বল। উত্তরে আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন,

কবিতা এমন বিষয়, যা আমার হৃদয়ে উদিত হয়। অতঃপর তা আমার মুখ দিয়ে বের হয়।"[১০] একদা হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) এর পুত্রকে বাঘে কামড় দিলে তিনি অতি আকর্ষণীয় ভাষায় উক্ত বাঘের বর্ণনা দেন–

"মনে হল গায়েতে তার
ডোরাকাটা দু'টি চাদর"

একথা শুনে হাস্‌সান বিন সাবিত (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম! এটা কাব্যময় বাক্য।"[১১] হাস্‌সান (রা) এর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তৎকালীন আরবে ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে কবিতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হত। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক জুরজী যায়দান কবিতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "কবিতা হল শব্দের মাধ্যমে কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলা, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং যাতে আনন্দের উপকরণ বিদ্যমান।" তিনি আরো বলেন, "শুধু ছন্দোবদ্ধ বাক্যই কবিতা নয়, বরং মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তোলা তথা অপ্রকাশ্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার নামই কবিতা।"[১২] প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমদ হাসান যায়্যান বলেছেন, "কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।"[১৩] বাংলা সাহিত্য-সমালোচক মাহবুবুল আলম বলেন, "প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবি মনে সৃষ্ট বিচিত্রভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কবিতা বলা চলে।"[১৪]

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, কবির মনের কল্পনাকে শৈল্পিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সুন্দর ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে কবিতা বলা হয়।

কবিতার পরিচয় যা-ই হোক, কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে তা চর্চা করা কতটুকু সঙ্গত তা জানা মুসলমানমাত্রই সমীচীন।

পবিত্র কুরআনে কবিতা প্রসঙ্গে ঃ পবিত্র কুরআনে বিশ্বমানবতার কবিতা ও কবি প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

১। وما علمناه الشعر وما ينبغى له ان هو الا ذكر وقران مبين

"আমি তাকে কবিতা রচনা শিখাইনি, আর তা তাঁর জন্য সমীচীন নয়। বরং এটা উপদেশ বাণী ও সুস্পষ্ট কুরআন।"[১৫] অন্যত্র বলা হয়েছে–

২। والشعراء يتبعهم الغائبون الم ترى أنهم فى كل واد يهيمون
وانهم يقولون مالا يفعلون .

"বিভ্রান্ত লোকেরাই কেবল কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাও না যে, তারা প্রত্যেকে উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরে বেড়ায়? তারা যা না করে তা বলে বেড়ায়।"[১৬]

উল্লিখিত আয়াত দু'টি থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় কবিতা রচনা ও চর্চার প্রতি ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই এর মর্ম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম আয়াতে মহানবী (স) এর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের ধরন আলোচিত হয়েছে। কাফিররা যখন মহানবী (স)-কে আরবের কবিদের ন্যায় একজন কবি এবং আল কুরআনকে কবিতা বলে মন্তব্য করতে লাগল, ঠিক তখন তার প্রতিবাদে বলা হল, তিনি কবিতা আবৃত্তি করে সময় কাটানোর মানুষ নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল। তাদের অবান্তর সেই দাবির কথা কুরআন পাকের অন্যত্র মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন–

بـل قـالـوا اضـغـاث احـلام بـل افـتره بـل هـو شـاعـر فلـيـاتـنـا بـايـة كـمـا ارسـل الاولـون .

"তারা বলে এ কুরআন তার অবাস্তব স্বপ্ন, নাহলে সে এটা মিথ্যা রচনা করেছেন। না হয় সে একজন কবি। সুতরাং পূর্ববর্তীগণ যেভাবে নিদর্শন আনয়ন করেছেন সে অদ্রূপ নিদর্শন আনয়ন করুক।"[১৭] তাদের এহেন দাবি খণ্ডনার্থ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

انـه لقـول رسـول كـريـم ومـا هـو بـقـول شـاعـر قـلـيـلا مـا تـؤمـنـون .

"নিশ্চয়ই এটা মহান রাসূলের আনীত বাণী। এটা কোন কবির কথা নয়। তোমাদের খুব অল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনয়ন করে থাকে।"[১৮] সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতটিতে কবিতা রচনা করার বৈধতা-অবৈধতার কথা আলোচিত হয়নি। বরং মহানবী (স) এর করণীয় এবং কুরআনের সত্যতা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে আরবের কবিদের প্রকৃতি ও তাদের অনুসারীদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা উপত্যকায় উদভ্রান্ত ঘুরে বেড়ায়, যা না করে তা বলে। অর্থাৎ মিথ্যা প্রলোভন ও প্ররোচনায় মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। আর বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে। এ আয়াতটিতে বাহ্যত কবি ও কবিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব ফুটে উঠেছে। আর এ কারণেই এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা), কা'ব ইবন মালিক (রা), হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এই তিনজন সাহাবী কবি কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (স) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কবিদের সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আর আমরাতো কবি।" মহানবী (স) বললেন, পরের আয়াতটি পড়। দেখবে ঈমানদার ও নেক্‌কারদের প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়নি। তারা এর পরবর্তী আয়াত–

الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكرو الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ـ

"কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"[১৯] এ আয়াতটি পড়ে তারা নিশ্চিত হলেন যে, কুরআনে ঈমানদার ও সৎ কবিদের নিন্দা করা হয়নি।"[২০]

বস্তুত কবিতার প্রতি কুরআনে বিরূপ মন্তব্য করার কারণ হল, কবিরাই তৎকালীন আরবে কলহ-বিবাদের মূল ছিল। তারা উস্কানিমূলক ও নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করে গোত্রে গোত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করত। 'আমর ইব্‌ন কুলসুমের কবিতা তাগলাব গোত্রকে দু'শ বছর পর্যন্ত বীরত্বের নেশায় বিভোর রেখেছিল। কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধসমূহ করেছিল তার অধিকাংশই ছিল কবিদের উস্কানিতে।"[২১] এছাড়া তখনকার যুগে আরবের কবিদেরকে দেবতাতুল্য মনে করা হত। নিকলসন যথার্থই বলেছেন–

"When there appeared a poet in a family of Arabs, the other tribes round about would gather together to that family and wish them joy of their good luck. Feasts would be got ready, the women of the tribe would join together in bands, playing upon lutes, as they were won't to do at bridals, and the men and boys would congratulate one another; for a poet was a defence to the honour of them all. A weapon to ward off insult from their good name, and a means of perpetuating their glorious deeds and of establishing their fame forever."[২২] কবিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় আয়াতটির মাধ্যমে তাদের এ ধরনের মনোভাবকে নিকৃষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাশাপাশি মহানবী (স) সম্বন্ধে এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

আর মহানবী (স) তো আরবদের কবিদের মত মাতাল ছিলেন না। এরশাদ হয়েছে– وما صاحبكم بمجنون

"তোমাদের সাথী পাগল নন।"[২৩]

দ্বিতীয় আয়াতটিতে মূলত জাহলী যুগের কবিদের ন্যায় প্রবৃত্তির অনুসরণে কাব্যচর্চার মাধ্যমে জনগণকে মাতিয়ে তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাগিব ইসফাহানীর অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন–

ولكن الشعر مقر الكذب * قيل الشعر اكذبه

"কারণ হল কবিতা মিথ্যার ঘাঁটি

উত্তম কবিতা সেটি, বেশি মিথ্যা যেটি।"[২৪]

অতএব, স্পষ্ট হল যে, ইসলামী ভাবধারায় কাব্যচর্চাকে কুরআনে নিরুৎসাহিত করা হয় নি।

মহানবী (স)-র দৃষ্টিতে কাব্যচর্চা

মহানবী (স) ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান, মার্জিত, রুচিশীল, স্পষ্টভাষী ও মননশীল মহামানব। তিনি সকল বিষয়ের ন্যায় কবিতার মার্জিত রূপকে অপছন্দ করতেন না। কখনো তিনি সুন্দর কবিতাগুলো আগ্রহ ভরে শুনতেন, কখনো এর প্রশংসা করতেন, কখনো পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কখনো এর প্রতি অন্যদের অনুপ্রাণিত করতেন আবার কখনো উত্তম কবিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেন। কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল "প্রতিটি রচনা কল্যাণকর ও শালীন হলে তা উত্তম ও সাদরে গ্রহণযোগ্য চাই তা পদ্য হোক কিংবা গদ্য হোক। আর কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন হলে তা ঘৃণিত ও অবশ্য পরিত্যাজ্য।" এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেছেন–

انما الشعر كلام مؤلف مماوافق الحق منه فهو حسن ومالم يوافق الحق منه فلا خيرفيه .

"কবিতা হল সুসামঞ্জস্য কথামালা। যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ তা সুন্দর। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে তাতে কোন কল্যাণ নেই।"[২৫] ইমাম বুখারী (র) الادب المفرد গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام حسينه كحسن الكلام وقبيحة كقبيح الكلام .

"আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, কবিতা সাধারণ কথার মতই। ভাল কথার ন্যায় ভাল কবিতা সুন্দর এবং খারাপ কথার ন্যায় খারাপ কবিতা অসুন্দর।"[২৬]

অন্য হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشعر كلام

فمن الكلام خبيث وطيب "কবিতা তো কাব্য বিশেষ। আর বাক্যের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়ই থাকে।"[২৭] যে সকল কবিতা মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তা অন্তরে লালন করা ও আবৃত্তি করা উভয়ই দূষণীয়। তাইতো মহানবী (স) বলেছেন– "তোমাদের কারো পেটে কবিতা থাকার চেয়ে পেটে পুঁজ পরিপূর্ণ হয়ে পচে যাওয়া উত্তম।"[২৮] এ হাদীসে মহানবী (স) ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী কবিতাসমূহকে বুঝিয়েছেন। এমর্মে হযরত 'আইশা (রা) বলেছেন, "রাসূল (স) কবিতা দ্বারা ঐ সমস্ত কবিতাকে বুঝিয়েছেন যাতে কুৎসা বর্ণিত হয়েছে।"[২৯] রাসূলুল্লাহ (স) যেমন নিকৃষ্ট কবিতা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন তেমনি উত্তম ও মার্জিত কবিতার প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেছেন–

ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمة

"কোন কোন বর্ণনায় থাকে জাদু। আর কোন কোন কবিতায় থাকে জ্ঞানের কথা।"[৩০] সুতরাং প্রতীয়মান হল যে কবি ও কাব্যচর্চাকে রাসূল (স) ঢালাওভাবে খারাপ মনে করতেন না, বরং ভাল কবিতাকে তিনি পছন্দ করতেন এবং খারাপ কবিতাকে অপছন্দ করতেন।

এছাড়া কবিতা চর্চা সম্পর্কে মহানবী (স)-এর মনোভাব তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বয়ং মহানবী (স)-র কাব্যচর্চা

কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করার চেয়ে বহু গুণে মর্যাদাসম্পন্ন কাজে মহানবী (স) তাঁর জীবনকে অতিবাহিত করেছেন। তা হল কুরআন অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। কবিতা আবৃত্তি তাঁর স্বভাবসুলভ ছিল না। সে কারণে আল্লাহ বলেছেন, "ওয়ামা ইয়ামবাগী লাহু" তাঁর জন্যে তা সমীচীন নয়। তথাপি যেহেতু উত্তম কবিতা শরীআত বিরোধী নয়, সে কারণে কখনো কখনো তিনি কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন। হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, হুনাইনের যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ হওয়াজিন গোত্রের তীরের আঘাতের ফলে মুসলমানদের কতিপয় লোক

পিছু হটে গিয়েছিল তখন মহানবী (স) একটি সাদা খচ্চরের ওপরে আরোহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং কাব্যিক ভঙ্গিতে বলেছিলেন–

انا النبى لا كذب * انا ابن عبد المطلب

"নবী আমি মিথ্যা না তা

আব্দুল মুত্তালিব আমার দাদা।"[৩১]

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আহযাবের যুদ্ধের দিন আমি রাসূল (স)-কে মাটি বহন করতে দেখলাম। তাঁর বুক ধুলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। আর সে অবস্থায় তিনি আবৃত্তি করলেন–

والله لولا الله ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولآ صلينا

فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام ان لا قينا

ان الاولى قد بغوا علينا * اذا ارادوا فتنة ابينا

"১. কসম খোদার! তিনি যদি না থাকতেন সাথে

না থাকিতাম তাঁর পথে ও সালাত-সাদাকাতে।

২. নাযিল করুন মোদের ওপর শান্তি ও রহমত

শত্রু মোকাবেলায় মোদের দৃঢ় করুন পদ।

৩. বিদ্রোহ করেছে পূর্বের শত্রু মোদের প্রতি

ওরা ফিৎনা ফাসাদ চাইলে মোরা জানাই অস্বীকৃতি।"[৩২]

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পরিখার নিকট আগমন করলেন। তখন মুহাজির ও আনসারগণ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সকাল বেলা পরিখা খনন করছিলেন। এ কাজের জন্য তাঁদের কোন চাকর ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের তৃষ্ণা, ক্ষুধা ও শীত-কাতরতা দেখে আবৃত্তি করলেন

اللهم ان العيش عيش الاخره * فاغفر الانصار والمهاجرة

"আল্লাহ তাআলা! আখিরাতই আসল জীবন

আনসার এবং মুহাজিরদের তাই ক্ষমা করুন।

এর প্রতি উত্তরে সাহাবীগণ (রা) আবৃত্তি করলেন–

نحن الذى بايعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا ابدا

"শপথ নিলাম মোরা মুহাম্মদের (স) হাতে

করব জিহাদ জীবন যদ্দিন থাকবে সাথে।"

রাসূল পুনরায় তাদের সান্ত্বনা স্বরূপ আবৃত্তি করলেন–

اللهم لاخير الاخير الاخرة * فبارك فى الانصار والمهاجرة

"আল্লাহ তাআলা! আসল কল্যাণ আখিরাতে
আনসার ও মুহাজিরদের ধন্য করুন বারাকাতে।"[৩৩]

হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খন্দক খননের সময় নিম্নোক্ত চরণ আবৃত্তি করেন–

بسم الله وبه هدينا * ولو عبدنا غيره شقينا
يا حبذا وحب دينا

"আল্লাহর শপথ! তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছি হিদায়াত
পাপী হব যদি করি তাঁর ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত
কত সুন্দর তুমি হে রব! কত সুন্দর দীন দীনিয়াত।"[৩৪]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স) কখনো কখনো আনন্দ-কৌতুক করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করতেন। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা) এর এক ভাইয়ের নাম ছিল আবূ উমায়ের। তার একটি পোষা পাখি ছিল। সেটির নাম ছিল নুগায়ের। একদা সেটি মারা যাওয়ায় আবূ উমায়ের খুব বিষণ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তার বিষণ্নতা দূর করার জন্য কৌতুকবশত আবৃত্তি করলেন–

يا ابا عمير * ما فعل النغير

'হে আবূ উমায়ের
কি করিল নুগায়ের।"[৩৫]

কবিতা রচনার প্রতি রাসূলের (স) নির্দেশ

ইসলামে কবিতা রচনা করা নিষেধ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে জিহাদের ন্যায় উত্তম কাজ। মহানবী (স)-কে উদ্দেশ করে কাফির মুশরিকরা যখন ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন তিনি কাফিরদের অশোভনীয় আচরণের যথার্থ জবাব দেয়ার জন্য সাহাবীদের (রা) উদ্দেশে বললেন–

ماذا يمنع نصرو الله ورسوله باسلحتهم ان ينصروه بالسنتهم

"যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে সাহায্য করেছে, তাদেরকে কথা দ্বারা সাহায্য করতে কোন জিনিস বাধা দিয়েছে?"[৩৬] মহানবী (স)-এর এ বাণীর প্রেক্ষিতে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে এলেন তিন সাহাবী কবি। তারা

হলেন-হাস্সান বিন সাবিত (রা), কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)।[৩৭] রাসূল (স) তাঁদের জন্য দু'আ করলেন। এমনকি হাস্সান বিন সাবিত (রা)-এর জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর তৈরি করে দিলেন। তার উপর দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৩৮] কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনার সুবিধার্থে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি আবূ বকরের (রা) কাছে যাও। তিনি তোমাকে কুরায়শদের দোষ-গুণ বাতলে দিবেন। এরপর কুরায়শদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা কর। এ কাজে জিবরাইল (আ) তোমার সাথে থাকবেন।"[৩৯] কুরায়শদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করার নির্দেশ দিয়ে মহানবী (স) ভাবলেন, তিনিতো কুরায়শ। তাই তিনি বললেন, তুমি কিভাবে কুরায়শদের নিন্দা করবে? কেননা আমিও তো কুরায়শ। হাস্সান বিন সাবিত (রা) বললেন, "মথিত ময়দার মধ্য থেকে চুলকে যেভাবে বের করে আনা হয় আমি সেভাবেই আপনাকে আলাদা করে রাখব।"[৪০] মহানবীর (স) কথামত হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা) কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ানের বিরুদ্ধে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করলেন-

الا ابلغ اباسفينا عنى * مغلغلة فقد برح الخفاء
بان سيوفنا تركت عبدا * وعبد الدار سادتها الاماء
هجوت محمدا فاجبت عنه * وعند الله فى ذالك الجزاء
اتهجوه ولست له بكفوء * فشر كما لخير كما الفداء

"আমার পক্ষ থেকে কেউকি জানিয়ে দিবে আবু সুফিয়ানকে
তার গোমর ফাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে।
আমাদের তরবারি বানিয়ে ছাড়বে তোমাকে দাস
দাসীরা নেতৃত্ব দিবে তাই গোত্র আবদুদ্ দার।
নিন্দা করেছ তুমি মুহাম্মদের, জবাব দেই তার আমি
প্রতিদান দিবেন তার মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী
নিন্দা করেছ তাকে তুমি নও তাঁর সমকক্ষ
তোমাদের মন্দরা হোক ভালদের তরে উৎসর্গ।"[৪১]

এভাবে তিনি কবিতা রচনা করে ইসলামীবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।[৪২] এর ফলে মহানবী (স) অত্যন্ত খুশি হলেন। হাস্সান বিন সাবিত (রা) এরপর থেকে যতদিন জীবিত ছিলেন মহানবী (স)-এর খিদমতে কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। এ জন্য তাঁকে شاعر الرسول। বা রাসূলের কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।[৪৩]

কাব্যচর্চায় রাসূলের (স) পৃষ্ঠপোষকতা

রাসূল (স) কবিতা শ্রবণ করতেন। কখনো কখনো তিনি কবিতা শ্রবণ করে ভাল মন্তব্য করতেন। ফলে কবিরা উৎসাহিত হত। একবার তরফা রাসূলের (স) সামনে নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করলেন–

ستبدی لك الایام ما كنت جاهلا * ویاتیك بالاخبار من لم تزود

"তুমি যে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলে সময় অতি সত্বর তা তোমার কাছে প্রকাশ করে দিবে এবং যাদের কথা তুমি জমা করে রাখনি তাদের কথা অবশ্যই তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।"

এটা শুনে মহানবী (স) বললেন– এটাতো নবুওয়াতের কথা।[৪৪] হযরত আ'ইশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন মদীনার মহিলা ও শিশুরা মহানবী (স)কে নিম্নোক্ত সঙ্গীত গেয়ে স্বাগত জানিয়েছিল–

طلع البدر علینا * من ثنیة الوداع

وجب الشكر علینا * مادعی لله داع

"উঠেছে গগনে পূর্ণ শশী
ছানিয়া বিদা ভেদ করে
ডাকেনি কেউ আর খোদার রাহে
শোকর ওয়াজিব তাঁর তরে।"[৪৫]

কাব্যচর্চায় রাসূলের (স) উদ্বুদ্ধকরণ

রাসূল (স) কখনো কখনো সাহাবীদেরকে কবিতা আবৃত্তিতে নির্দেশ দিতেন– কখনো উদ্বুদ্ধ করতেন। তামীম গোত্রের কবি আয্যিরকান ইবন বাদ্র একদা স্বগোত্রের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করছিল, রাসূলুল্লাহ (স) তখন হাস্সান বিন সাবিত (রা)-কে কবিতার মাধ্যমে তার প্রতিউত্তর দেয়ার নির্দেশ দেন। হাস্সান (রা) নিচের কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন–

ان الذوائب من فهرو اخوتهم * قد بینوا سنة للناس تتبع

قوم اذا حاربوا ضرواعدوهم * اوحالوا النقع فی اشیاعهم نفعوا ـ

"ভাইয়েরা মিলে বানিয়েছে এক আদর্শ মানুষের জন্য
মানতে চাইলে সে আদর্শ অনুকরণযোগ্য।
এমন জাতি তারা যুদ্ধ করলে দুশমনদের ক্ষতিগ্রস্ত করে
উপকার চাইলে করে নিজেদের তরে।"[৪৬]

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাকে (রা) রাসূলুল্লাহ (স) একবার কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতে বলেন। তখন আব্দুল্লাহ (রা) আবৃত্তি করেন–

قبلت لله ما اتاك من حسن * قفوت عيسى باذن الله والقدر

"আমি গ্রহণ করেছি সুন্দর সে ব্যবস্থা
যা তিনি দিয়েছেন আপনাকে ঈসার দ্বীন করেছিলাম গ্রহণ
আল্লাহর নির্দেশে ও তাকদীরের কারণে।"[৪৭]

তখন রাসূল (স) তা শুনে বলেছিলেন, তুমি বাস্তবই আল্লাহর জন্য করেছ।

এছাড়াও বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রা) ইসলাম গ্রহণকালে কবিতা আবৃত্তি করে শুনালে মুগ্ধ হয়ে মহানবী (স) তাকে বললেন, "খুনাস! আরো শুনাও।"[৪৮]

কবিদের জন্য রাসূলের (স) দু'আ

কাব্যচর্চার মাধ্যমে যারা ইসলামী চেতনাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন মহানবী (স) তাদের নাজাত ও জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতেন। কখনো কখনো তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন। হাস্‌সান (রা) যখন কুরায়শদের নেতা আবু সুফিয়ানের (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) নিন্দায় নিম্নোক্ত চরণটি আবৃত্তি করলেন–

هجوت محمدا فاجبت عنه * وعند الله فى ذالك الجزاء

"নিন্দা করেছ তুমি মুহাম্মদের (স), আমি জবাব দেই তার
আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই পাব এর যোগ্য পুরস্কার"

তখন মহানবী (স) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন–

جزائك عند الله الجنة يا حسان "হে হাস্‌সান! আল্লাহর নিকট তোমার পুরস্কার রয়েছে জান্নাত।"[৪৯] বর্ণিত আছে, হাস্‌সান (রা) এর জন্য রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়শই দুআ করতেন– اللهم ايده بروح القدوس "হে আল্লাহ! রুহুল কুদ্‌স (জিবরাইল আ) এর মাধ্যমে তুমি তাকে সাহায্য কর।"[৫০]

আবু লায়লা নাবিগা আল-জা'দী (রা) যখন রাসূলের (স) সামনে আবৃত্ত করেন–

بلغنا السماء مجدنا وجد ودنا * وانا لنرجو فوق ذالك مظهر

"মর্যাদা ও মহিমায় আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষ পৌঁছেছি নীলাভ্র ভেদ করে আরো চাই তারও ঊর্ধ্বে যাক আমাদের বিজয় নিশান।"[৫১]

রাসূলুল্লাহ (স) তা শুনে বললেন, "তা কোথায় হে আবু লায়লা?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স) জান্নাতে আপনার সাথে।" রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখতে পাবে একদিন।"[৫২]

কবিদেরকে রাসূল (স) এর পুরস্কার প্রদান

রাসূল (স) ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা শ্রবণ করে অত্যন্ত খুশি হতেন। এমনকি তিনি কখনো কখনো খুশি হয়ে কবিদেরকে পুরস্কৃত করতেন। আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। মহানবী (স) তা শুনে তাকে একটি কাপড় প্রদান করেন।[৫৩]

হযরত কাব বিন যুহায়র (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে তাঁর প্রশংসায় রচিত নিম্নোক্ত কবিতাটি পেশ করেন–

ان الرسول لنور يستضاء به * مهند من سيوف الله مسلول

"নিশ্চয়ই রাসূল (স) এক আলোক রশ্মি, তাঁর থেকে কামনাও করা যায় আলো। তিনি আল্লাহর তরবারির মধ্য থেকে এক ধারালো তরবারি।

রাসূল (স) তাঁর প্রতি ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করে নেন এমনকি এ কবিতা শুনে তাঁকে তাঁর চাদর দান করে পুরস্কৃত করেন।[৫৪]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হল যে, মহানবী (স) কাব্যচর্চা পছন্দ করতেন। আর সে কারণে কাব্যচর্চা ইসলামে শুধু বৈধই নয়, অনেক ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ।

বিশিষ্ট সাহাবীদের (রা) কাব্যচর্চা

মহানবী (স) এর বিশিষ্ট সাহাবীগণ (রা) ছিলেন ইসলামী বিধিবিধানের বাস্তব নমুনা। তাঁরা তাঁদের জীবনে রাসূলুল্লাহ (স) এর পূর্ণ অনুকরণের মাধ্যমে ইসলামী বিধানের সফল প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। কাব্যচর্চা ইসলামে নিষিদ্ধ না হওয়ায় বিশিষ্ট

সাহাবীগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষণে কবিতা আবৃত্তি করতেন। মদীনায় হিজরত করার পর আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে অনেক সাহাবী (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় আবৃত্তি করলেন—

كل امرئى مصبح فى اهله * والموت ادنى من شراك نعله

"সকলেই তার পরিবারের সাথে সকাল অতিবাহিত করে

অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অতি নিকটে।"[৫৫]

হিজরতকালের ভয়াবহ বিপদের স্মৃতিচারণ করে তিনি রচনা করলেন একটি কবিতা। তার অংশ বিশেষ হল–

قال النبى ولم اجزع يرقونى * ونحن فى سدف من ظلمة النار

ولا تخش شيئا فان الله ثالثنا * وقد توكل لى منه باظهار

"নবী বললেন, আমি যেন না হই বিচলিত

সকল বিপদ দূর হবে শীঘ্র, হবে তা অতীত।

আমরাতো ছিলাম তখন গুহার গহ্বরে

ছিলাম সেথা গুহায় মাঝে নিঝুম অন্ধকারে।

বললেন তিনি কোন কিছুকে না যেন করি ভয়

আমার ও তোমার তৃতীয় সত্তা আল্লাহতো সহায়।

ভরসা কর আল্লাহর উপর লাভ কর অভয়

তাঁর পক্ষ থেকে তখন ছিল সুস্পষ্ট বিষয়।"[৫৬]

উহুদ যুদ্ধে তালহা (রা) রাসূল (স)কে যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আবু বকর (রা) কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করেন–

نحن حماة غالب ومالك * نذب عن رسولنا المبارك

نضرب عنه القوم فى المعارك * ضرب صفاح الكوم فى المبارك

"আমরা বিজয়ী ও মালিকের প্রতিরোধকারী ও সাহায্যকারী বাঘের দল,

আমাদের পবিত্র রাসূলের (স) পক্ষে আঘাত প্রতিরোধ সর্বদা অবিচল।

তাঁর পক্ষ থেকে আমরা হানিব আঘাত যুদ্ধের ময়দানে

উটের গলা ও মুখমণ্ডলে আঘাতের ন্যায় উট রাখার স্থানে।"[৫৭]

হযরত উমর ফারুক (রা) নিজে যেমনি আনন্দ-বেদনার বিশেষ মুহূর্তগুলোতে কাব্যচর্চা করতেন, তেমনি কাব্যচর্চার প্রতি অন্যদেরকে উৎসাহিতও করতেন। শিশুদের কবিতা শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য বলেন–

علموا اولادكم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباورهم ما يحمل من الشعر .

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তিরন্দাজ শিক্ষা দাও। আর তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেন ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাদেরকে সুন্দর সুন্দর ও ভাল কবিতা বলে দাও।"[৫৮]

তিনি কবিতার প্রশংসায় আরো বলেন–

الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اعلم منه

"কবিতা হল কোন জাতির এমনই এক জ্ঞানভাণ্ডার, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নেই।"[৫৯]

তিনি আরো বলেন–

الشعر جذل من كلام العرب

"কবিতা আরবদের কথামালার একটি বিনোদনমূলক বিষয়।"[৬০]

আরেকবার তিনি বলেন– افضل صناعات الرجل الابيات من الشعر

"মানুষের উত্তম শিল্প ও সৃষ্টি হল কবিতা।"[৬১]

হযরত উমর (রা) তাঁর জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এতে তাঁর কাব্যপ্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত উমর (রা) আবৃত্তি করেছিলেন–

الحمد لله ذى المن الذى وجبت * له علينا ايادما لها غير

وقد بدأنا لكذبنا فقال لنا * صدق الحديث نبى عنده الخبر

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অনুগ্রহকারী। তার প্রশংসা করাই আমাদের কর্তব্য, আর কারো নয়। আমরা ছিলাম মিথ্যার মধ্যে ডুবে। অতঃপর তিনি সত্য পথের কথা বলেছেন তিনিতো নবী। তাঁর কাছে সকল খবর আছে।[৬২]

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) যখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তখন অধিকাংশ সময় এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন–

خفض عليك فان الامو * ربكف الاله مقاديرها

فليس ياتيك منهيا * ولا قاصر عنك مامورها

"তোমার নিজের উপর নম্র আচরণ কর। কারণ সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রণাধিকার ও পরিমাণ নির্ধারণ আল্লাহর হাতে। তাই নিষিদ্ধ জিনিস তোমার কাছে আসবে। না। আর যে সমস্ত কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা তোমার থেকে কম হবে না।"[৬৩]

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন–

الم تر أن الله اظهر دينه * على كل دين قبل ذالك حائد

وأسلبه من اهل مكة بعد ما * تداعوا إلى امر من الغى فاسد

"তুমি কি দেখনা যে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এর পূর্বে তারা সঠিক পথ থেকে দূরে ছিল। মক্কাবাসীর নিকট থেকে তা সরিয়ে নিয়েছেন তারা একে অপরকে বক্রতা ও গোমরাহীর দিকে ডাকার পর।"[৬৪] জীবন সায়াহ্নে যখন উমর (রা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর কোলে মাথা রাখা অবস্থায়ও কবিতা আবৃত্তি করেছেন–

ظلوم لنفسى ولكنى مسلم * اصلى الصلوة كلها واصوم

"আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি। কিন্তু আমি মুসলমান, সকল নামায আদায় করি এবং রোযা রাখি।"[৬৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত উমর (রা) কাব্যচর্চা করতেন এবং তার প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল ইতিবাচক।

হযরত উসমান (রা) খুব কম কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তবে একই কবিতা তিনি বারবার আবৃত্তি করতেন। নামাযের আযান শুনে তিনি আবৃত্তি করতেন।

مرحبا بالقائلين عدلا * وبالصلوة مرحبا واهلا

"যারা সত্য-সঠিক কথা বলছে তাদেরকে স্বাগতম আরো শুভেচ্ছা স্বাগতম সালাতকে।"[৬৬]

বিদ্রোহীরা তাঁকে ছুরিকাঘাতের মাধ্যমে শহীদ করার পর তাঁর ধনভাণ্ডারকে লুট করতে থাকে। তাঁর সিন্দুক খুলে তারা একটি কাগজে তাঁর ওসিয়ত দেখতে পায়, যার অপর পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত কবিতার চরণ দু'টি দেখতে পায়। জীবদ্দশায় তিনি প্রায় এ চরণ দু'টি আবৃত্তি করতেন।

غنى النفس يغنى النفس حتى يكفها * وان عضها حتى يضربها الفقر

وما عسرة فاصبرلها ان لقيتها * بكائنة الا سيتبعها يسر

"আত্মার ধনাঢ্যতা সে আত্মাকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। এমনকি সে যদি দরিদ্রও হয়ে যায় তবুও তার এই আত্মার ধনাঢ্যতা তাকে সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে বিরত রাখে। দুঃখ কষ্ট যদি তোমার উপর আপতিত হয় ধৈর্য ধারণ কর, দেখবে কিছুই না। কেননা এই দুঃখ কষ্টের পরই রয়েছে স্বস্তি।"[৬৭]

কবিতা সম্পর্কে হযরত আলী (রা)ও ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন–

الشعر ميزان القوم او ميزان القول

"কবিতা হল জাতির পরিমাপদণ্ড বা কথার পরিমাপদণ্ড।"[৬৮]

তিনি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করতেন। তিনি যখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তখন নিম্নোক্ত কবিতার চরণ দুটি আবৃত্তি করতেন।

ای یومی من الموت افر * یوم لا یقدر ام یوم قدر

یوم لا یقدر لارهبه * ومن المقدور لاینجو الحذر

"কোন দিন আমি মৃত্যু থেকে পলায়ন করব, যে দিন নির্ধারিত হয় নি সেই দিন থেকে, না যে দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে সে দিন থেকে? যে দিন নির্ধারিত হয়নি সে দিনকে আমি ভয় করি না। আর যে দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে সে দিন থেকে কোন সতর্কতাই মুক্তি দিতে পারে না।"[৬৯]

যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন হযরত আলী (রা)। খয়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (স) যখন তাঁকে পতাকা প্রদান করে যুদ্ধে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করলেন, তখন মারহাব নামক এক ইয়াহুদী কবিতার মাধ্যমে তাকে যুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত আলী (রা) তখন দীপ্ত কণ্ঠে নিচের চরণ দুটির মাধ্যমে তাঁর গর্বকে খর্ব করে দেন–

انا الذی سمتنی امی حیدرة * کلیت غابات کریه المنظرة

او فیهم بالصاع کیل السندرة .

"আমি সেই ব্যক্তি যার মা তাঁকে নাম দিয়েছেন হায়দার।

আমি জঙ্গলের বীভৎস দস্যুরূপী সিংহ।

আমি শত্রুবাহিনীকে পরিমাপ করি সানদারা (বিদ্যুৎ গতিতে) পরিমাপ।"[৭০]

উহুদ, সিফ্‌ফিন যুদ্ধসহ প্রায় প্রতিটি যুদ্ধের প্রাক্কালেই হযরত আলী (রা) কবিতা আবৃত্তি করে শত্রুবাহিনীর অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করেন। মদীনার মসজিদ নির্মাণের সময় হযরত আলী (রা) ইট ও চুন সুরকির যোগান দিতেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন-

لا يستوى من يعمر المساجد يرائب

فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا

"যে মসজিদ নির্মাণ করে দাঁড়িয়ে

আর যে বসে বরদাশ্‌ত করে এই কষ্ট

তাদের সমকক্ষ হতে পারে না কোন দিন সেই ব্যক্তি

যে ধূলি মলিন হবার ভয়ে

বরাবর এ কাজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে।"[৭১]

মোটকথা, কাব্যর্চচায় খুলাফায়ে রাশিদার প্রত্যেকেই পারদর্শী ছিলেন, প্রত্যেকেই ছিলেন উন্নতমানের কবি। বিশিষ্ট তাবিই সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, হযরত আবু বকর, উমর ও আলী (রা) প্রত্যেকেই কবি ছিলেন। হযরত আলী ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।[৭২]

হযরত আলীর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থও রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো نهج البلاغة (নাহজুল বালাগাহ) ও ديوان على (দীওয়ানি আলী)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আ'ইশা (রা)ও কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুখ-দুঃখ ও বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্তে কবিতা আবৃত্তি করে আবেগ-অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকর (রা) এর রোগ যখন বেড়ে যায় তখন আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। অতঃপর হুঁশ ফিরলে আমি আবৃত্তি করলাম ঃ

من لا يزال دمعه مقنعا * فان من دمعه مدفون

"এই সেই ব্যক্তি যার অশ্রু সর্বদা লুক্কায়িত থাকে।

কারণ তার (আমার) কিছু অশ্রু থাকে প্রোথিত।"[৭৩]

বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের বড় বড় নেতা মৃত্যুবরণ করায় হযরত আ'ইশা তাদের উদ্দেশে শোকগাথা আবৃত্তি করেন।

হযরত উসমান (রা) শহীদ হবার পর মদীনার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় হযরত (আ'ইশা (রা) আক্ষেপ করে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

ولوان قومى طاعتنى سراتهم * لا نقذتهم من الجبال او الخبل

"আমার কওমের সর্দারগণ যদি আমার কথা মানত তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে এই অধঃপতন ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম।"[৭৪]

রাইসুল মুফাস্সিরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) কবিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

الشعر علم العرب وديوانه فتعلموه وعليكم بشعر الحجاز

"কবিতা হল আরবদের জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাদের জীবনালেখ্য। তাই তোমরা তা শিক্ষা গ্রহণ কর। বিশেষ করে হিজাযের কবিতা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৭৫]

তিনি নিজেও কবিতা আবৃত্তি করতেন। বসরা থেকে কুফা যাওয়ার পথে উট চালাতে গিয়ে তিনি আবৃত্তি করেন–

اوبى الى اهلك يا رباب * اوبى فقد حان لك الاياب

"ওগো বন্ধু ! তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে চল। তোমার প্রত্যাবর্তনের সময়তো ঘনিয়ে এল।"[৭৬]

ইসলামী কবিতাচর্চা যুগে যুগে

সাহাবা কিরামের পরেও যুগে যুগে মুসলিম মনীষীগণ আল্লাহর শানে হাম্দ, মহানবী (স) এর শানে না'ত, ইসলামী আদর্শ-আকীদা সম্বলিত অসংখ্য কবিতা রচনার মাধ্যমে ইসলামী চেতনাকে মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এতে কেউ কেউ অলৌকিকভাবে মহান আল্লাহর সাহায্য পেয়েছেন, কারো কারো ভাগ্যে স্বপ্নে মহানবী (স) এর দর্শন লাভ করার সৌভাগ্যও হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যচর্চায় আল্লাহ ও রাসূলের (স) সমর্থনতো রয়েছেই, আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় কাজ ও সওয়াবও বটে। বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদী (রা) সংক্ষিপ্ত পরিসরে মহানবী (স) এর জীবন চরিত্র তুলে ধরার মানসে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখেন—

بلغ العلى بكماله
كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله

"নিজ গুণে পৌছেছেন তিনি সকলের শীর্ষে
বিশ্বজাহান আলোকিত হল তাঁহার সৌন্দর্যে
তাঁর স্বভাব-চরিত্র সবই অতীব সুন্দর"

এ তিনটি লাইন লিখে চতুর্থ লাইনটি মিলানোর জন্যে ভাবতে থাকেন। চার লাইনে মহানবী (স) এর চরিত্র-মাধুর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি সাবলীল যথাযথ বাক্য প্রয়োগ করার দৃঢ় মানসিক অভিপ্রায় নিয়ে ভাবতে থাকেন। ভাবতে ভাবতে বার বছর কেটে গেল। একদিন ইশার সালাতের পর জায়নামাযে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তখন তিনি রাসূল এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি দেখতে পান, রাসূল (স) তাকে বললেন, এতই যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে লিখ।

صلوا عليه واله

"দরুদ' পাঠাও তাঁর ও তার পরিবারের উপর।"[৭৭]

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মুহাম্মদ শরফুদ্দীন ইব্‌ন সাঈ আল বুসীরী দীর্ঘদিন যাবৎ পক্ষাঘাত রোগে ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর শানে একটি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন এবং তার অছিলায় মহান আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির ইচ্ছা পোষণ করেন। নিয়ত অনুযায়ী একদা তিনি ভক্তিসহকারে কাসীদাটি আবৃত্তি করে রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তিনি মহানবী (স) এর দর্শন লাভ করেন।

তিনি মহানবী (স)কে স্বপ্নে পুরো কাসীদাটি পাঠ করে শুনান। মহানবী (স) খুশি হয়ে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন এবং তার গায়ে স্বীয় বুরদাহ (চাদর) জড়িয়ে দেন। ফলে তার রোগ ভাল হয়ে যায়।

ঘুম থেকে জেগেও তিনি দেখতে পান যে, তার কোন রোগ নেই এবং শরীরে কোন ধরনের কষ্ট নেই। সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার পর কবির সাথে তার বন্ধু শেখ আবু রাজার সাথে সাক্ষাৎ হয়। আবু রাজা কবিকে বললেন, জনাব! আপনার সেই কাসীদাটি আমাকে দিন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর শানে রচনা করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে কাসীদা তুল বুরদার কথা কাউকে জানান নি। তাই তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আপনি কোন্ কাসীদাটি চাচ্ছেন? আমিতো রাসূলুল্লাহ (স)-এর শানে অনেক কবিতা রচনা করেছি। বন্ধু বললেন, সেটির প্রথম চরণ হল–

امن تذكر جيران بذى سلم

مزجت دمعاجرى من مقلة بدم

"সলম গাছের উদ্যানে তুমি স্মরণ করিয়া প্রতিবেশী জনে
মিশালে কি তব নয়নের ঝরা অশ্রুকে লাল রক্ত সনে?"

কবি বুসীরী তখন তাকে বললেন, হে আবু রাজা, তুমি কোথা থেকে এই কবিতা মুখস্থ করেছ? আমিতো ইতিপূর্বে কাউকে এ কাসীদা শুনাইনি। তিনি বললেন, আমি গতকাল শুনছিলাম আপনি রাসূলুল্লাহ (স) এর সামনে এটি আবৃত্তি করেছেন এবং তার ফলে রাসূলুল্লাহ (স) তেমনি আন্দোলিত হয়েছেন যেমন ফলদার বৃক্ষ বাতাসে আন্দোলিত হয়। অবশেষে বুসীরী তার বন্ধুকে উক্ত কাসীদাটি প্রদান করেন।[৭৮]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, কাব্যচর্চা হোক আর সাহিত্যের অন্য কোন শাখা হোক তাতে যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রশস্তি আলোচিত হয় এবং ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠে তা অবশ্যই ইসলাম সমর্থিত এবং নেক কাজ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী ভাবধারায় কাব্যচর্চা কলমী জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ইবাদাতের শামিল।

তথ্যনির্দেশ

১. জালালুদ্দীন আবদুর রহমান আস্‌সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১, মুস্তফা আলবানী, মিসর।

২. কুরআন শরীফ, সূরা ত্বহা, আয়াত ৫, অনুবাদঃ ড. মুস্তাফিজুর রহমান, পৃষ্ঠা ২২৫, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

৩. কুরআন শরীফ, সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ৩৬, অনুবাদঃ ড. মুস্তাফিজুর রহমান, পৃষ্ঠা ৩১৭, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

৪. প্রাগুক্ত, সূরা আল হাক্‌কা, আয়াত– ৪১-৪২।

৫. প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৩।

৬. প্রাগুক্ত, সূরা আত্‌তুর; আয়াত-৩৪।

৭. প্রাগুক্ত, সূরা হুদ; আয়াত-১৩।

৮. প্রাগুক্ত, সূরা আল বাক্বারা, আয়াত-২৪।

৯. প্রাগুক্ত, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮৮।

১০. শিহাবুদ্দীন ইবন আব্‌দ রাব্বিহী ঃ আল ইকদুল ফারীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৩, মুস্তাফা মুহাম্মদ, মিসর, ১৯৩৫।

১১. আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২৫শ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩২, বি.তা.বি.মিসর।

১২. জুরজী যায়দান : তারিখ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১, ২য় সংস্করণ, মাকতাবুল হিলাল, মিসর, ১৯২৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮।

১৪. মাহবুবুল আলম : বাংলা ছন্দের রূপরেখা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২, সপ্তম সংস্করণ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা।

১৫. আল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৬৯।

১৬. প্রাগুক্ত, সূরা আশ্‌শূয়ারা, আয়াত-২২৪-২২৬।

১৭. প্রাগুক্ত, সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৫।

১৮. প্রাগুক্ত, সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত-৩৯-৪০।

১৯. প্রাগুক্ত, সূরা আশ্‌শুয়ারা, আয়াত-২২৭।

২০. আ. ত. ম মুসলেহ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (টীকা) পৃ. ১২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২১. শিবলী নোমানী : নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, আরবী কাব্য সাহিত্য (বাংলা), পৃষ্ঠা ১৮৫।

২২. R.A.Nicholson : A Literary History of the Arabs, Pg-71

২৩. আল কুরআন, সূরা আত্‌তাকবীর, আয়াত–২২।

২৪. রাগিব ইসফাহানী : আল মুফরাদাত, পৃষ্ঠা-২৬১, দারুল মাআরিফা, বৈরুত।

২৫. ইব্‌ন রাশীক আল কায়রাওয়ানী : কিতাবুল উমাদা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯ ও দায়েরায়ে মাআরিফ-ই-ইসলামিয়্যা, ১৫শ, পৃ. ৫২৯

২৬. ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১১, বশির এন্ড সন্স কলিকাতা।

২৭. ইব্‌ন রাশীক : প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১।

২৮. বুখারী ও মুসলিম।

২৯. আবদুল জলীল : কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃ. ৯১ ই. ফা, বা প্রকাশনা, ১৯৯৫।

৩০. আবু দাউদ : আস্‌সুনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪। তিরমিযী আল জামি আস্ সহীহ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

৩১. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী : সহীহ আল-বুখারী পৃ. ৬১৭।

৩২. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯।

৩৩. ইউসুফ কান্দুলুভী : হায়াতুস সাহাবা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, ৩১৯, ৩২০, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

৩৪. ইবন কাছির : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ, খণ্ড, পৃ. ২০।

৩৫. তিরমিযী জামে আস্‌সহীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।

৩৬. ইব্‌ন হিশাম: আস্‌ সীরাতুন নবুবিয়্যা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪।

৩৭. ড. শওকী দায়ফ: তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭।

৩৮. ড. শওকী দায়ফ : প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৭। ইবনুল আসীর : উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড,. পৃ-৪, দারুল ইহ্‌ইয়া ইততুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

৩৯. ইবন আব্‌দ রাব্বিহী : আল ইকদুল ফারীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৪০. আবু আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী : প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০৯, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, দেওবন্দ, ভারত।

৪১. জামি আস্‌সহীহ লিল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০৮-৯০৯। আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৬৪, ইফাবা প্রকাশনা, ঢাকা।

৪২. ইব্‌ন হাজার আসকালানী : আল ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৬২।

৪৩. ড. শাওকী দায়ফ : তারিখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।

৪৪. ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহি : প্রাগুক্ত, ৩য়, খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।

৪৫. ইউসুফ কান্দালবী : হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

৪৬. ইব্‌ন হিশাম: আস্‌ সীরাতুন নববিয়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭

৪৭. ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহি : আল ইকদুল ফারীদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।

৪৮. হাসান যায়্যাত : তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৫১

৪৯. আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন : আরাবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৫৭ ইফাবা প্রকাশনা, ঢাকা।

৫০. আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

৫১. অনুবাদ, সালাম, আযাদী, মাসিক কলম, সম্পাদক, আব্দুল মান্নান তালিব, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯৪, বর্ষ ২৫, সংখ্যা-১০।

৫২. আস সিবাঈ আল বায়্যূমী : তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭০

৫৩. ইবন আব্‌দ রাব্বিহ : আল ইকদুল ফরীদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০১

৫৪. আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৫৫. ইউসুফ কান্ধালাবী : প্রাগুক্ত, ২য়, খণ্ড, পৃ. ৫১০।

৫৬. ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

৫৭. ইউসুফ কান্ধালাবী : প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।

৫৮. জাবী জাদাহ্ আলী ফাহমী : হুসনুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, ১০।

৫৯. ইব্ন রাশীক : প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

৬০. ইব্ন আবদ রাব্বিহ : প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪।

৬১. ইব্ন আব্দ রাব্বিহ : প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯০।

৬২. ইবন হিশাম : আস সীরাতুন নাবাবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

৬৩. ইউসূফ কান্ধালাবী : প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড পৃ. ৩৬।

৬৪. ইবনুল আছীর : আল কামিল ফিত্ তারীখ ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।

৬৫. ইবনুল আছীর : প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।

৬৬. আল মারযুবানী : মুজামুশ্ শুআরা, পৃ. ২৫৪।

৬৭. ইব্ন রাশীক প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

৬৮. ইব্ন রাশীক : প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

৬৯. ইব্ন আবদ রাব্বিহ : প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

৭০. ইউসুফ কান্ধালাবী : প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫।

৭১. মাওলানা হাজী মঈন উদ্দীন নদভী : সাহাবা চরিত-১, পৃ. ২৫৫,২৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭।

৭২. ইব্ন আবদ রাব্বিহ : প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬।

৭৩. ইউসুফ কান্ধালাবী : প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮।

৭৪. সাইয়্যেদ সুলাইমান নাদাভী : সীরাতে আয়েশা, পৃ. ২৫৩।

৭৫. জাবী যাদাহ আলী ফাহমী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৭৬. ইব্ন আবদ রাব্বিহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

৭৭. বদরুল ইসলাম মুনীর : ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও সাহিত্যিক, পৃ. ৫৬, বিবর্তন প্রকাশনী, ঢাকা।

৭৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : ক্বাছীদাতুল বুরদাহ কাব্যানুবাদের ভূমিকা, পৃ. ৯-১০, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা।